ধারাবাহিক রচনা

রামকৃষ্ণোপনিষদ

প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা

(সেপ্টেম্বর ২০১৯ সংখ্যার পর)

কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখ কথিত বাণীসমূহকে যদি উপনিষদ আখ্যা দেওয়া যায়, তাহলে তার অন্তর্গত এটি একটি গভীর মর্মার্থবাহী মন্ত্র। নির্গুণ, নিরাকার, সর্বব্যাপী শুদ্ধ চৈতন্যরূপী ব্রহ্মসত্তাকে ধরাছোঁয়ার মধ্যে আনার, বা তাকে trace করার এটি একটি সূত্র। জীবশরীরের কোনও যন্ত্র দিয়েই তাকে ধরাছোঁয়া যাবে না। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি সবই জড়ের কবলে। তাহলে তার অস্তিত্বের সন্ধান হল কী করে? উত্তরে বলা যায়, ঋষিদের ধ্যানলব্ধ ইনি; তাঁদের শুদ্ধপবিত্র হৃদয়ে উদ্‌ভাসিত হয়েছে ব্রহ্মাকারাবৃত্তি। তাঁদের শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত জীবচৈতন্যের আধারে তা প্রতিফলিত হয়েছে—'যথাদর্শে তথাত্মনি' (কঠোপনিষদ), সেখান থেকেই তাঁদের উত্তরণ 'ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে', তখন তাঁরা 'ব্রহ্মলোকে মহীয়তে'। এ না হলে নির্গুণ, নিরাকারকে ধরবে কে? তাঁকে তো দৃশ্যবস্তুর মতো, গুণযুক্ত বিশেষ বস্তুর মতো শব্দের বন্ধনে বেঁধে determine করা যাবে না, কারণ তাঁর সম্পর্কে বলতে গেলে সকলেই তো speechless, শ্রীরামকৃষ্ণের অনবদ্য আলংকারিক উপস্থাপনায়—''ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হননি।''

এখন প্রশ্ন, এই নির্গুণ, নিরাকার, নিষ্ক্রিয় শুদ্ধ চৈতন্যসত্তার ধারণা এল কী করে? বলা যেতে পারে, এই পরিবর্তনশীল জগদ্‌বৈচিত্র্যের অন্তরালে এক অপরিবর্তনীয় চরম সত্তা বা সত্যের অস্তিত্ব অনুমান করে তার অনুসন্ধানে রত হয়ে ধ্যানসহায়ে সেই সত্য সাক্ষাৎকার করেছেন ঋষিরা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কৃত উপমা প্রয়োগে এ-ভাবটি বোধগম্য করানো যেতে পারে। নদীর পারে একটি শেকল বাঁধা। তার বাকি অংশ নদীগর্ভে প্রবেশ করানো রয়েছে। শেকলের দৃশ্য অংশটি কোনও ব্যক্তিকে কৌতূহলী করে তুলল, সে ওই শেকলের কড়া ধরে ধরে নদীর গভীরে ডুব দিয়ে অন্বেষণ করে কোনও দেবতার একটি মূর্তি পেল। তখন সে সেটি তুলে এনে সকলকে দেখাল। ঋষিদের মননেও এই সীমায়িত অস্থায়ী দৃশ্যজগতের পিছনে কোনও স্থায়ী অদৃশ্য অসীম, অনন্ত সত্তার ধারণার জন্ম হয়েছিল, কারণ সীমার দর্শনই অসীমের প্রত্যাশাকে জাগিয়ে তোলে। এই সসীম জগতের 'কড়া' ধরে ধরেই তাঁদের অসীম সত্তার দর্শন এবং সেই দর্শনের বলেই তাঁরা অন্যান্যদের জানিয়ে গেছেন যে এক শুদ্ধ চৈতন্য জ্ঞানসত্তাই নিজেকে জীব ও জড় জগদ্‌রূপে প্রতিভাত করেছেন; তিনিই একমাত্র চিরন্তন, শাশ্বত

সত্য বা তত্ত্ব এবং তাঁর 'বিবর্ত' এই জগৎ 'গমনশীল' বা পরিবর্তনশীল, নশ্বর, তাই মিথ্যা—ব্রহ্মের মতো ত্রৈকালিক সত্য নয়। ব্রহ্মসত্তাই ব্যাপকতম, সবকিছু ব্যাপ্য করে রয়েছেন—'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্' (ঈশোপনিষদ) কিন্তু তিনি নির্গুণ, নিরাকার, নিষ্ক্রিয়; তাহলে প্রশ্ন, তাঁর 'বিবর্ত'রূপ ক্রিয়া সম্ভব কী করে?

এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মের শক্তি বা মায়াশক্তি স্বীকৃত হয়েছে। কেনোপনিষদে বর্ণিত একটি কাহিনিতে এমন কথাই বলা হয়েছে। দেবতারা নিজ নিজ শক্তিতে অসুরদের বিনাশ করেছেন, অজ্ঞতাজনিত এমন অহমিকা দূরীকরণে মহামায়া আদ্যাশক্তির আবির্ভাব ঘটে ও তিনি তাঁদের জানান যে ব্রহ্মশক্তি সহায়েই দেবতারা অসুরনিধন করেছেন। এই ব্রহ্মশক্তিই 'মায়া' বা মূল অবিদ্যা, যা পরমাত্মা বা শুদ্ধ ব্রহ্মে লীন থাকেন, এবং এই শক্তিতে আরূঢ় হয়েই ব্রহ্ম জগতের সৃজন, পালন ও ধ্বংস করেন। তিনি 'মায়াধীশ'। কিন্তু মায়াযুক্ত হয়ে যখন ক্রিয়াশীল হন, তখন তিনিই মায়াধীন 'ঈশ্বর'।

সুতরাং রূপের 'কড়া' ধরে ধরেই অরূপকে ধরতে হবে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ''রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশা করি।" নামরূপের পরিচিত জগতকে ধরেই নামরূপের স্রষ্টার অনুসন্ধান এবং সেই নামরূপহীন চৈতন্যসত্তার সাক্ষাৎকার। 'সাক্ষাৎ অপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম।' আর এই সত্যদর্শনের ওপর নির্ভর করেই, মর বা নশ্বর শরীরধারী মানবকুলের প্রতি ঋষিদের ঘোষণা—'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ', কারণ তাঁরা অবহিত হয়েছেন, যে-অমৃত ব্রহ্মসত্তাজাত এই জীবজগৎ, তারই অমৃতময় বৈভব এটি। আমাদের চিন্তাজগতেও, সম্পর্কিত হয়েই কতকগুলি ধারণা গড়ে ওঠে, তাদের 'relative concept'-রূপে গণ্য করা হয়। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, ''যার আলোবোধ আছে, তার অন্ধকারবোধও আছে; যার ভালবোধ আছে, তার মন্দবোধও আছে...।" তেমনই আমাদের সীমার বোধের সঙ্গে অসীমের বোধও জড়িত। মানুষ নিজেকে সীমিত ক্ষমতার অধিকারী বলেই মনে করে, আবার এর সঙ্গেই অবশ্যম্ভাবিরূপে জড়িয়ে আছে অসীম, অখণ্ড শক্তির ধারণা; তার ফলেই অসীম, অনন্ত শক্তির অন্বেষণে মন ধাবিত হয়। এই জগতের সসীম বস্তুসম্ভারের 'খেই' ধরেই অপ্রকাশিত শক্তির মূলে পৌঁছনোর কথা অবতারপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বসাধারণের জন্য বলে গেছেন। জ্ঞানমার্গ অবলম্বন, ধ্যানযোগে নির্বাসনা হয়ে ঋষিকল্প ব্যক্তিদের যে-নিরন্তর ব্রহ্মসাধনা—সে তো সকলের পক্ষে সম্ভব নয়! অথচ সেই ব্রহ্মচৈতন্য সকল মানুষের মধ্যেই রয়েছে অংশ-অংশী সম্বন্ধে বা বিম্ব-প্রতিবিম্ব সম্বন্ধে। যেমন এক বিম্ব সূর্য, তার অনন্ত প্রতিবিম্ব পড়েছে সর্বত্র, পাত্র বা আধার অনুযায়ী, কোথাও কম কোথাও বেশি। সুতরাং 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'—এবং এই মতের সপক্ষে যুক্তিবিচার প্রয়োগ করে তার প্রতিষ্ঠায় তৎপর হয়েছেন আচার্য শংকর, যিনি তৎকালে বেদ-উপনিষদ প্রতিপাদিত সনাতন ধর্মকে বৌদ্ধ Nihilism বা নিরীশ্বরবাদের হাত থেকে রক্ষার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন বলা যেতে পারে। একইসঙ্গে বৈদিক সকাম যাগযজ্ঞাদি কর্মকাণ্ডের প্রভাব ও প্রচার প্রতিরোধে, নিষ্কাম ব্রহ্মসাধনায় বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গ অবলম্বনে আত্মজ্ঞানলাভ ও বিদেহ মুক্তির পথ দেখিয়ে সন্ন্যাসব্রতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে তৎপর হয়ে তিনি ধর্মের ক্ষেত্রে অশেষ কল্যাণসাধন করে গিয়েছেন।

কিন্তু শংকরাচার্যের বেদান্তদর্শন বা কেবলাদ্বৈতবাদে ব্রহ্মের সঙ্গে তাঁর জগৎসৃজনকারী মায়াশক্তিকে সমমানে স্থিত করা হয়নি। স্বয়ং মহামায়াই একদা আচার্যকে তাঁর এই ভ্রম সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন শবদেহকে নিজে সরে যেতে বলার আদেশ দিয়ে। অন্যান্য বেদান্তবাদীরা

আচার্যের মত খণ্ডন করেছেন এই যুক্তি দিয়ে যে, মায়া বা মূল অবিদ্যা বা শক্তির locus বা অবস্থান কোথায় হবে? হয় সে ব্রহ্মেই থাকবে, নয় সে স্বাধীন সত্তা হিসাবে ব্রহ্মের বাইরে থাকবে। ব্রহ্মে অবস্থান করলে তার দ্বারা ব্রহ্ম লিপ্ত হবেন, আর পৃথক সত্তা হিসাবে স্বীকার করলে আচার্যের অদ্বৈতবাদ খণ্ডিত হবে। তবে তিনি ঐন্দ্রজালিকের উপমা দিয়ে ব্রহ্মেই মায়ার স্থিতি দেখিয়ে তর্কের নিরসন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিষয়টিকে আরও বোধগম্য করেছেন এই উপমায় যে, সাপের মধ্যেই বিষ থাকে, তার দ্বারা সাপের কিছু হয় না, কিন্তু সে যাকে কামড়ায় তার মৃত্যু হয়।

দ্বিতীয় যে-বিতর্ক ওঠে সেটি হল, চৈতন্যসত্তা থেকে শুদ্ধ জড়ের সৃষ্টি হয় কী করে? তার উত্তরে অবশ্য শংকরপন্থীরা মানবশরীরেই শুদ্ধ জড়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিয়ে বলেছেন, নখ ও কেশ কর্তন করলে কোনও সংবেদন হয় না, অথচ এগুলি তো চৈতন্যসত্তা থেকেই সৃষ্টি। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীকে বিশুদ্ধ জড় ঘটি-বাটি-চৌকাঠকে চৈতন্যময়রূপে দর্শন করিয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই দার্শনিক কূট তর্কবিচারের অবসান ঘটিয়ে যে-সত্য বা তত্ত্ব আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন সেটি হল, ব্রহ্ম ও তাঁর জগৎ-সৃজনকারী শক্তি বা মায়া ব্রহ্মের সঙ্গে অভেদ। অর্থাৎ ব্রহ্ম ও তাঁর শক্তি পৃথক সত্তা নন, বা ব্রহ্মের থেকে শক্তির সত্যতা কম নয়। চৈতন্যেরই শক্তি, জড়ের নিজস্ব কোনও শক্তি নেই। উপরন্তু ব্রহ্মকে শক্তিসমন্বিত ভাবতেই হবে, নাহলে যুক্তির কষ্টিপাথরে জগদ্ব্যাপারকে যাচাই করা যাবে না।

বাংলার যে-তন্ত্রসাধনার ধারা, যার চৌষট্টি প্রকার সাধনায় ভৈরবী ব্রাহ্মণীর নির্দেশে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সিদ্ধিলাভ করেন ও চৈতন্যময়ী মাতৃশক্তির মহিমা উপলব্ধি করেন, সেই সত্য বা তত্ত্বকে তিনি বৈদিক বা ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদের সঙ্গে সমন্বিত করে জনসমাজের অনন্ত কল্যাণ সাধন করেছেন।

তন্ত্রে চৈতন্যময়ী শক্তিই একমেবাদ্বিতীয়ম্, —তিনিই মহামায়া, জগৎপ্রসবিনী পরমেশ্বরী, তিনিই পরাশক্তি। শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে রয়েছে, ''পরাঽস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়া চ'' (৬।৮)—এই পরাশক্তিরই বহুবিধ প্রকাশ এবং তিনিই জীবের স্বাভাবিক জ্ঞান, বল ও ক্রিয়ারূপে প্রকাশিত। অর্থাৎ শুধু জ্ঞান নয় বা শুধু ক্রিয়া বা কর্মশক্তি নয়, উভয়ই। আচার্য শংকরের মতবাদে এই জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয়তত্ত্বটি অবহেলিত। তিনি শুধু আত্মজ্ঞানের সাধনাকেই অধ্যাত্মজগতে অগ্রাধিকার দিয়ে গেছেন। তাই বৃহত্তর জনসমাজের প্রতি কর্তব্য বা সেবার ভাবটি—যা কর্মের মাধ্যমেই সাধিত হতে পারবে—তার দিকে দৃষ্টি দেননি।

আচার্য শংকর সেযুগের প্রয়োজনে স্বর্গাদি সুখলাভে যাগযজ্ঞাদি সকাম কর্মের সাধনকে রহিত করে বেদ-উপনিষদুক্ত আত্মজ্ঞানের চর্চায় মুক্তিলাভের পথকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এযুগের প্রয়োজনে 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' এই ভাবটিকে সকলের জন্য প্রচার না করে, 'জীব স্বরূপত ব্রহ্ম বা ঈশ্বর' এই আদর্শের সাধনে বেশি জোর দিয়েছেন—ত্যাগ ও সেবার দ্বারা এবং স্বামী বিবেকানন্দকে জ্ঞানমার্গী ধ্যানতপস্যা থেকে সরিয়ে এনে জগতের সেবায় নিযুক্ত হতে নির্দেশ দিয়ে জ্ঞানসমন্বিত কর্মকেই জগৎকল্যাণের পথ বলে তুলে ধরেছেন, যেখানে ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদাত্মক রূপে প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে এই একমেবাদ্বিতীয়ম্ চৈতন্যময়ী শক্তিরই লীলা বর্ণিত হয়েছে। তিনিই একমাত্র সত্য। ব্রহ্ম ও তৎশক্তি অভেদ—এই শাক্ত সিদ্ধান্তটি কেনোপনিষদের উপাখ্যান থেকেই জানা যায়। দেবীভাগবতের মতে সর্বভূতে শক্তি আত্মারূপে বিদ্যমান। এই মতে পরমপুরুষ (ব্রহ্ম) দুই ভাগে বিভক্ত—একভাগ সচ্চিদানন্দ ও অন্যভাগ মায়া,

পরাশক্তি প্রভৃতি। কিন্তু দুটি ভাগ মূলত অভিন্ন। বহ্নি ও তার দাহিকাশক্তির মতো পরম পুরুষ ও পরমা প্রকৃতি অদ্বৈত। দেবীভাগবতে আছে, ''সেয়ং শক্তির্মহামায়া সচ্চিদানন্দরূপিণী/ রূপং বিভর্ত্যরূপা চ ভক্তানুগ্রহহেতবে''—সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী মহামায়া, পরাশক্তি অরূপা হয়েও ভক্তগণকে কৃপা করবার জন্য রূপধারণ করেন। তিনিই চৈতন্য ও শক্তিসমন্বিতরূপেই সর্বত্র বিরাজিত। অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ ব্রহ্মকে স্বীয় আত্মারূপে উপলব্ধি করে বলেছেন, ''আমি এই আকাশ ও পৃথিবীর অতীত, অসঙ্গ ব্রহ্মস্বরূপিণী, তথাপি স্বীয় শক্তিতে সমগ্র জগদ্রূপ ধারণ করেছি।'' (দেবীসূক্ত)

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর সাধনায় ব্রহ্ম ও শক্তিকে প্রথম থেকেই অভেদরূপে দর্শন করেন। তিনি কোনও দার্শনিক মতবাদ শংকরাচার্যের মতো academically প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করেননি। তাঁর অধ্যাত্মদর্শন সত্যের দর্শন ও তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ওপরেই গড়ে উঠেছে, যাকে যুক্তির দিক থেকেও খণ্ডন করা সম্ভব হয়নি আজ পর্যন্ত। তিনি নিজেও বলেছেন, ''এখানকার অভিজ্ঞতা বেদবেদান্তকে ছাড়িয়ে গেছে।'' একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাণকৃষ্ণকে বলছেন, ''ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। শক্তি না মানলে জগৎ মিথ্যা হয়ে যায়, আমি-তুমি ঘরবাড়ি পরিবার—সব মিথ্যা। ওই আদ্যাশক্তি আছেন বলে জগৎ দাঁড়িয়ে আছে। কাঠামোর খুঁটি না থাকলে কাঠামোই হয় না...।'' আবারও বলেছেন, ''অগ্নি মানলেই দাহিকাশক্তি মানতে হয়,... সূর্যকে বাদ দিয়ে সূর্যের রশ্মি ভাবা যায় না; সূর্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্যকে ভাবা যায় না।'' অর্থাৎ শক্তির এলাকা ধরে ধরে শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মে পৌঁছনো যাবে, আবার ব্রহ্মের স্বরূপ দর্শনেই শক্তির মহিমাও প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধ হবে। আত্মজ্ঞানের পর এই দর্শনকেই তিনি বিজ্ঞানীর দর্শন বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে ''ব্রহ্মজ্ঞানের পরও আছে। জ্ঞানের পর বিজ্ঞান।... জীবজগৎ তিনি হয়েছেন, এইটি দর্শন করার নাম বিজ্ঞান।'' ''জ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্রহ্ম আর শক্তি দুটি পৃথক বোধ হয়, বিজ্ঞানীর ক্ষেত্রে অভেদ—এক; তখন জগতই ব্রহ্মময়।'' তিনি বলেছেন দ্ব্যর্থব্যঞ্জকভাবে—''বেদান্তবিচারের কাছে রূপটুপ সব উড়ে যায়; সে-বিচারের শেষ সিদ্ধান্ত—ব্রহ্ম সত্য আর নামরূপযুক্ত জগৎ মিথ্যা। বেদান্তদর্শনের বিচারে ব্রহ্ম নির্গুণ। তাঁর কী স্বরূপ মুখে বলা যায় না। কিন্তু যতক্ষণ তুমি নিজে সত্য, ততক্ষণ জগতও সত্য। ঈশ্বরের নামরূপও সত্য, ঈশ্বরকে ব্যক্তিবোধও [Personal God] সত্য।'' দার্শনিক বিচার-বিতর্ক—সবই বুদ্ধির ক্রিয়া, শব্দের মারপ্যাঁচের ওপর তার প্রতিষ্ঠা, কিন্তু বুদ্ধিও জড়ের কবলে, তাই তাকে দিয়ে চৈতন্যের স্বরূপ নির্ণয় সম্ভব নয়। প্রবচন, মেধা, শ্রবণকে ছাড়িয়ে সমাধিতে পৌঁছলে, ['নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন' (কঠোপনিষদ)]—যেখানে জীবচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্য একাকার বা 'identified' হতে পারছে—সেখানেই অধ্যাত্মসাধকের জ্ঞানের চূড়ান্ত সীমা এবং সেখানেই শুদ্ধ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার নির্গুণ নিরাকার রূপে। এক্ষেত্রে কী হয়, সেকথা শ্রীরামকৃষ্ণ জানাচ্ছেন, ''... সমাধি হলে... ব্রহ্ম নির্গুণ [absolute]। তখন তিনি কেবল বোধে বোধ হন।'' ''যখন নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন না, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি, পুরুষ বলি; আর যখন ওই সব কাজ করেন তখন তাঁকে শক্তি বলি, প্রকৃতি বলি।'' ''কালী আর কেউ নয়, যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই কালী। কালী আদ্যাশক্তি। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন ব্রহ্ম বলে কই। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন [ক্রিয়ার দিক থেকে দেখি], তখন শক্তি বলে কই,... ব্রহ্ম আর কালী অভেদ।'' ''ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। ওকেই শক্তি, ওকেই কালী আমি বলি।''

যিনি নির্গুণ ব্রহ্ম, যিনি সমাধিতে জীবচৈতন্যরূপ-জলে বিম্বসূর্যরূপে প্রতিবিম্বিত হয়ে ধরা দিয়েছেন,

যাঁকে দর্শন করার আর অন্য কোনও উপায় নেই, তিনি যেমন সত্য, তাঁর মায়িক প্রকাশ এই জগতও সত্য। এই মায়িক প্রকাশের সত্যতা ধরা পড়ে বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে। শুদ্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্রহ্ম ও শক্তি—দুটি পৃথক বোধ হয়। বিজ্ঞানীর ক্ষেত্রে তাঁরা অভেদ—এক, তখন জগতই ব্রহ্মময়। তখন জগতই সগুণ ব্রহ্ম, কার্য ব্রহ্ম। উপনিষদে নির্গুণ ও সগুণ—ব্রহ্মের উভয় প্রকারের উপাসনার মন্ত্র একই—'ওঁ', একই আলম্বন উভয়ের জন্যই। সুতরাং এখানেও প্রকারান্তরে নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের অভেদত্ব স্বীকৃত হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রায়ই সাধক রামপ্রসাদের এই গানটি গাইতেন, ''মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে, যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে/সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত, অভাবে কি ধরতে পারে।''

অর্থাৎ দার্শনিক বিচার-বিতর্ক দিয়ে অধ্যাত্মতত্ত্ব বা সত্য নির্ণয় সম্ভব নয়, তা প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয়, যার ভাষাগত রূপ নেই, আছে ভাবগত রূপ, তা 'বোঝে প্রাণ বোঝে যার'। উপনিষদই ঘোষণা করেছেন, 'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া'। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, শংকরাচার্য 'বিদ্যার আমি' রেখেছিলেন, তাই লোকশিক্ষার জন্য ব্রহ্ম বিষয়ে 'কথা' বলেছেন, মানে তাঁকে ভাষা ব্যবহার করতে হয়েছে। অর্থাৎ তাঁকে 'সমাধি' বা ব্রহ্মজ্ঞানের স্তর থেকে কিছুটা নেমে আসতে হয়েছে ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ দেওয়ার সময়। কিন্তু ব্রহ্মদর্শন হলে জ্ঞানী চুপ হয়ে যান। রামকৃষ্ণদেব বলছেন, ''জ্ঞানী নেতি নেতি করে বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ করে ব্রহ্মসমীপে গমন করে। বিজ্ঞানী কিন্তু বিশেষরূপে তাঁকে জেনে আরও কিছু দর্শন করেন। তিনি দেখেন নেতি নেতি করে যাতে পৌঁছন গেছে, যাঁকে ব্রহ্ম বলে বোধে বোধ হয়েছে, তিনিই আবার জীবজগত হয়েছেন, তখন তিনিই 'ইতি ইতি' করে নেমে আসেন।'' শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, চোখ বন্ধ করলে (অর্থাৎ ধ্যানে আবৃত্তচক্ষু হয়ে) তিনি (ঈশ্বর বা ব্রহ্ম) আছেন আর চোখ খুললে তিনি নেই—এ কি সত্য হতে পারে? তিনি স্বামীজীকে এই 'বিজ্ঞানীর সত্যের' সন্ধান দিয়েই বলেছিলেন, ''কি সমাধি সমাধি করছিস?'' বলেছিলেন, তার থেকে উচ্চতর স্তর আছে, সেটি প্রেমের স্তর, যেখানে পৌঁছলে জীবজগতের সবকিছুর সঙ্গে একাত্মতালাভের অনন্ত আনন্দ ও পরমাশান্তি লাভ হয়। তিনি তাই তাঁর প্রিয়তম শিষ্যকে শুষ্ক জ্ঞানী নয়, রসে বশে স্থিত বিজ্ঞানী হওয়ার পথটি দেখিয়েছেন। এই 'বিজ্ঞানী' স্তরটির সংবাদ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূর্ববর্তী অবতারকল্প পুরুষদের অধ্যাত্ম-উপদেশের মধ্যে লক্ষিত হয়নি। এক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণদেব একান্তভাবেই মৌলিক চিন্তার অধিকারী।

ভ্রম সংশোধন

গত জানুয়ারি ২০২০ সংখ্যার ৫৫৪ পৃষ্ঠায় প্রথম স্তম্ভের প্রথম পঙ্‌ক্তিতে ১৮৫৪ স্থলে ১৯৫৪ হবে।